# শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০২

## ২৯ সেপ্টেম্বর — ৫ অক্টোবর

### শিশুর সুস্থ বিকাশ, সোনালী ভবিষ্যতের আশ্বাস

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অঙ্গসজ্জায় ঃ আপন

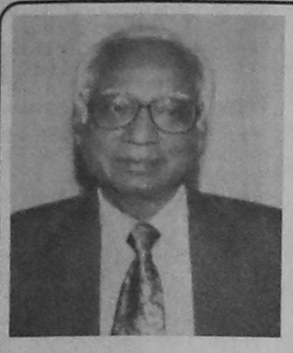

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

**বাণী**

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে দেশ-বিদেশের সকল শিশুর প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইলো।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সনদে ঘোষিত শিশু অধিকারের বিধানসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০০১-২০১০ দশককে শিশু অধিকার দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। শিশু অধিকারের বিধানগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের শিশুদের জন্য এক উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করা আমাদের সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশ ও জাতির আগামী দিনের পতাকাবাহী এই শিশুদের মানসিক ও শারীরিক পূর্ণ বিকাশের জন্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের সব নাগরিককে স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে। কোন শিশুই যেন বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

সব শিশু তাদের অধিকার, মৌলিক চাহিদা, মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার মাঝে যথার্থভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাক, এটাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

মন্ত্রী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**বাণী**

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

প্রতি বছরের মত যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব সহকারে দেশব্যাপী পালিত হতে যাচ্ছে শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০২ এবং বিশ্ব শিশু দিবস। শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের। শিশুর মৌলিক ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে রাষ্ট্র ও বিশ্ব আজ অংগীকারাবদ্ধ।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষরকারী প্রথম ২২টি দেশের অন্যতম। শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সংবিধানের মৌলিক নীতিমালা ও শিশু অধিকার সনদের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৪ সালের ৫ ডিসেম্বর তৎকালীন বিএনপি সরকার জাতীয় শিশুনীতি অনুমোদন করে।

শিশুদের উন্নয়নে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শিশুদের অধিকার, কল্যাণ ও উন্নয়নের সকল প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দিনটির আবেদন চির উজ্জল। এ কারণেই ৫ ডিসেম্বর কে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শিশু উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা। কন্যা শিশুর জন্য বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্যসমূহ নিরসনেও আমাদের সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মেয়ে শিশুদের প্রতি কোন বৈষম্য নয়, এই অঙ্গীকারকে সমুন্নত রাখতে ৩০ সেপ্টেম্বরকে কন্যা শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। আশার কথা, এর ফলে ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশুকে সমান সুবিধা প্রদানের পক্ষে সামাজিক দৃষ্টিভংগী জোরদার হচ্ছে।

এ বছরের শিশু অধিকার সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য 'শিশুর সুস্থ বিকাশ, সোনালী ভবিষ্যতের আশ্বাস'। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার এই শিশুদের দৈহিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক এবং মেধার পরিপূর্ণ ও স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলে আরো উদ্যোগী হবেন এটাই আমাদের আজকের প্রত্যাশা। আমি শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ,
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

(খুরশীদ জাহান হক)

## শিশুর সুস্থ বিকাশ–সোনালী ভবিষ্যতের আশ্বাস

ড. বেগম জাহান আরা
পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী।

আমাদের শৈশবের সঙ্গে এখনকার শিশুদের শৈশবের কোন মিল নেই বললেই চলে। আমাদের কালে মনে করা হতো শিশুরা ছোটো এবং কিছুই বোঝেনা। কিন্তু' গবেষকরা প্রমান করেছেন যে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁরা বলছেন, পাঁচ বছরের শিশুর মস্তিষ্ক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মতোই পূর্ণাঙ্গ। এ সময় মস্তিষ্কের সমস্ত- কোষই গঠিত এবং কর্মক্ষম অবস্থায় পৌছে যায়। আগামি দিনের সমস্ত সম্ভাবনা উপ্ত হয়ে যায় পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই। তারপর সুযোগ, পরিচর্যা ও পরিবেশ পেলে মস্তিষ্কের কোষে উপ্ত হওয়া সুপ্ত প্রতিভা ক্রমশ বিকশিত হয়। হয়তো কেউ চিত্রশিল্পী হতে পারতো অথবা হতে পারতো বিজ্ঞানী, কিন্তু কিছুই হয়না পরিবেশ ও পরিচর্যার অভাবে। এখনও আমাদের অনেকেই মনে করি, পাঁচ বছরের পরও শিশু শিখতে পারবে অনেক কিছু। তাই একটু বড়ো হওয়ার পর শিশুর প্রতি মনোযোগি হলেও চলবে। গ্রামীন জীবন দর্শনে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে শিক্ষার হার বেশ কম, সেই সব দেশের শিশুরা তাই বড়োই অবহেলিত। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিশ্বের যাবতীয় শিশুর প্রতি শিক্ষিত সচেতন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষন করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রনয়ণ করে শিশু অধিকার সনদ। জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য হচ্ছে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা।

প্রথম প্রশ্নই হতে পারে, শিশুর প্রাপ্য যত্ন ও সহায়তা আসবে কোথা থেকে? নির্দ্বিধায় বলা যায়, পরিবার পরিজন ও সমাজবাসীর কাছ থেকে। আমরা জানি, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের জীবন যাত্রার মান খুবই দু:খজনক । কারণটা অর্থনৈতিক। প্রত্যেকে নিজের জীবনযন্ত্রনায় এতো বিপর্যস্ত এবং বিপন্ন থাকে যে অন্যকে সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আর যারা বিত্তবান, তারা প্রায়শই চিত্তহীন। এই দ্বিমুখী সমস্যার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের শিশুরা বড়ো হয়। সেজন্যই শিশুদের প্রতি আমাদের যত্নের পরিমাণ বাড়াতে হয়।

জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশ হিসেবে এখন তাহলে কি আমাদের করণীয় এমন প্রশ্ন অনেকেই করতে পারেন। করেনও। কারণ শিশুর স্বার্থ মানেই যে ভবিষ্যতের স্বার্থ। এই দেশের আগামীর স্বার্থ। জীবন প্রবাহের বৃত্তে শিশুকে কেন্দ্র করেইতো আমরা পরিবার ও সমাজের কার্যক্রম সাজাই। সেখানে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও শিক্ষার কথাই প্রথমে এসে যায়। বস্তির শিশুরাই তো বিত্তবানদের অল্পদামে কেনা শ্রমিক। অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের জন্য তারা শ্রম দেয় হাটে বাজারে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, অফিস আদালত পাড়ায়, প্রশাসক এবং আইন প্রণয়ণকারী ব্যক্তিবর্গের ধারে পাশে। বিনিময়ে কিছু অর্থ আসে। শিশু শ্রমিক বলে বেশি পারিশ্রমিকের পরিবর্তে' পিচ্চি' বলে কম টাকাই দেয়া হয়। এরকমইতো শুনে থাকি আমরা। অর্থাৎ ঐ সব জায়গাতেও শিশুর স্বার্থ 'প্রথম ও প্রধান বিবেচনার বিষয়' হয়ে উঠতে পারেনি। এ অবস্থার নিরসন হোক এই আমরা চাই।

শিশুর সুস্থ বিকাশ মানে পরিপূর্ণ বিকাশ। শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকেই সমান যত্ন পেয়ে বড় হওয়া। এবং অবশ্যই তা বয়স অনুযায়ী সুষম বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন। অবশ্য স্বাস্থ্য সেবার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই বেশ জন সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে। সেটা পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃমঙ্গল সেবা এবং শিশুর টিকাদান কর্মসূচী, ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি' পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ' নামক সামাজিক আন্দোলন বেশ জোরদার হয়েছে। বিভিন্ন দাতাদেশের অনুদান পুষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শতোশতো কর্মী এক্ষেত্রে আন্তরিক শ্রমও দিচ্ছেন। অতএব সুফল পাওয়া যাচ্ছে প্রশংসিত পরিমানে।

শিশুর মানসিক বিকাশে সুকুমার বৃত্তির চর্চার বিকল্প নেই। অবশ্য মানসিক বিকাশের ভিত্তি রচনায় প্রারম্ভিক শৈশবের গুরুত্ব সম্পর্কে গবেষনালব্ধ তথ্য আমাদের শিশুর পূর্ণ বিকাশ সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবতে শেখাচ্ছে। শিশুর 'সাংস্কৃতিক অধিকার বাস্তবায়ন' ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে শিশু একাডেমী নামক অনন্য প্রতিষ্ঠান। পড়া লেখার পাশাপাশি শিশুর মধ্যে সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলোসহ তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা ভেবে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিশু একাডেমী। আর জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু সনদ ঘোষিত হলো ১৯৮৯ সালে। এই সনদের শর্তগুলোর অংশিদারিত্ব মেনে নিতে গিয়ে এখন মনে হয় শহীদ জিয়া ছিলেন তাঁর কালের চেয়ে বহুগুন অগ্রগামী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এক মহান নেতা।শিশুদেরকে তিনি রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভাবতেন। তারই ফসল হলো শিশু পার্ক, শিশু একাডেমী এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নির্মিত জিয়া শিশু মিলনায়তন। শুধু আমরা নই, বিশ্বের অনেক দেশই শহীদ জিয়ার এই মহৎ কীর্তিকে শ্রদ্ধা জানায়।

শিশু একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন, দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিশুদেরকে ছোটো থেকেই যোগ্য এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা হোক। তাই ঢাকার পর ১৯৮০-৮২ সালে বৃহত্তর ২০টি জেলায় শিশু একাডেমী স্থাপন করা হয়। সেটা ছিলো সাহস ও স্বপ্নের প্রতিষ্ঠা। দেশপ্রেমিক শহীদ জিয়া জানতেন যে শিশুদেরকে যদি সৎ সুস্থ ও মুক্তবুদ্ধির মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পরিবেশ দেয়া যায়, তাদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করা যায়, তাহলে দেশের সমৃদ্ধি আসবে মূল থেকে। সেটা হবে টেকসই ও নির্ভরযোগ্য। নির্ভীক দেশপ্রেমিক জননেতা তাই প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আর শিশুদের জন্য সেটাই ছিলো যথার্থ পদক্ষেপ।

ঐ সময়ের প্রায় দুই যুগ পর আজ যখন শিশু কার্যক্রম নিয়ে বিশ্বব্যাপি তোলপাড় হয়, তখন মনে হয় শহীদ জিয়া শুধু কালের পুর্ববর্তি মানুষই ছিলেন না, তিনি ছিলেন শিশু নীতি ও কার্যক্রমের সফল দ্রষ্টা। অনেক উন্নয়নশীল দেশ যাকে এখন মনে করছে অনুকরণীয়। যাই হোক, বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শিশু একাডেমীর কার্যক্রম বিস্তৃত হতে থাকে। ১৯৯৩-৯৫ সালের মধ্যে আরও ৪৪টি নতুন জেলায় ও ৬ টি উপজেলায় শিশু একাডেমীর শাখা অফিস স্থাপন করা হয়। আশা করা যায়, অদুর ভবিষ্যতে দেশের সকল উপজেলায় স্থাপন করা হবে শিশু একাডেমীর শাখা। দেশব্যাপি লক্ষ লক্ষ শিশু তখন শিশু একাডেমীর সেবা পাবে।

শিশু একাডেমীর বহুমুখি এবং বিস্তৃত কার্যক্রম-এর মধ্যে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা, মৌসুমী প্রতিযোগিতা, শিশু আনন্দমেলা ও বিজ্ঞান মেলা এবং সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, শিশু অধিকার সনদ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন, শিশু পত্রিকা, পুস্তক ও জ্ঞানকোষ প্রকাশনা বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার প্রদান, শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নানা প্রতিকুলতার কারণে বিভিন্ন দিকে অনগ্রসরতার মাঝেও আমাদের শিশুরা যে প্রতিভার জগতে অনেক বিষয়েই উন্নত বিশ্বের শিশুদের সমকক্ষ, তার প্রমান পাওয়া গেছে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। প্রতি বছরই আমাদের শিশুরা চিত্রাঙ্কনসহ নানা বিষয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বায়ত্বশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান। খুব কম উন্নয়নশীল দেশে শিশু একাডেমীর মতো একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এর জন্য আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয় শিশু একাডেমীর সকল কর্মকান্ডের প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখছেন।

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ঘোষনা করে। বাংলাদেশ সরকার এই সনদ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৯১ সালে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। শিশু বিষয়ক কর্মকান্ডকে সুবিন্যস্তভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৯৪ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়কে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় নামে পুর্নগঠন করা হয়। শিশু উন্নয়ন বিষয়টি আগের তুলনায় অধিক গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৯৪ সালে প্রণীত হয়েছে জাতীয় শিশুনীতি । এর প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে ১৯৯৭-২০০২ সালে শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০০২-২০০৭ সালের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বর্তমানে তৈরির পথে।

বস্তুতপক্ষে অল্পশিক্ষা এবং সুশিক্ষার অভাবে আমাদের দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ এখনও শিশুর মতো অফুরন্ত সম্ভাবনাময় মানবসম্পদের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। তাই মীনা কার্টুন অধিকাংশ মানুষের কাছে বিনোদনের বিষয়, শিশু উন্নয়ন সম্পর্কিত পোষ্টারগুলো দেয়াল সজ্জার উপকরণ এবং র‍্যালী জাতীয় সমাবেশকে আনন্দের বিষয় বলে মনে করা হয়। তাই সার্বিক সমন্বিত এবং জীবন ঘনিষ্ঠ শিক্ষা দিতে না পারলে শিশুকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। শিশুর সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করতে শিক্ষার পাশাপাশি শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা সবচেয়ে জরুরী। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল পিতামাতা, অভিবাবকসহ আপামর জনসাধারনকে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে এবারের প্রতিপাদ্য 'শিশুর সুস্থ বিকাশ- সোনালী ভবিষ্যতের আশ্বাস' নির্ধারণ করা হয়েছে।

জীবনের বৃত্তে শিশুই যে সূচনা এবং এই সূচনার ভিত্তি যেনো মজবুত ও সুঠাম হয়, সে ব্যাপারে বর্তমান সরকার যথেষ্ট সতর্ক এবং সচেতন। আশাবাদী আমরা। তাই প্রত্যয়সহ এগিয়ে যাবো নি:শঙ্ক চিত্তে।

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**বাণী**

শিশু উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং এ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও 'শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০০২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছরে শিশু অধিকার সপ্তাহের জন্য নির্বাচিত প্রতিপাদ্য 'শিশুর সুস্থ বিকাশ, সোনালী ভবিষ্যতের আশ্বাস' খুবই যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে। এ স্লোগান জনগণকে শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতন ও তা বাস্তবায়নে আগ্রহী করে তুলবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শিশু উন্নয়নের বিষয়টি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। শিশুরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে শিশুদের কল্যাণ ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৯৪ সালে এ দেশে আমরাই জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করেছি। এই নীতির আলোকে শিশু উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিকাশে শিক্ষাকে প্রাথমিক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্কুল উপস্থিতি নিশ্চিত করতে দরিদ্র শিশুদের পরিবারকে নগদ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও বিনোদনের ওপর জোর দিয়ে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। আমরা শিশুদের একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। শিশু অধিকার সপ্তাহে আমার আহ্বান, আসুন, আমরা সবাই শিশুদের উন্নয়নে একযোগে কাজ করি।

আমি 'শিশু অধিকার সপ্তাহ--২০০২'-এর সকল কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

সচিব

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

**বাণী**

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশুদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব সকলের। শিশুদের প্রতি আমাদের সকলের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সকলকে সচেতন, উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ বছরও সারা দেশ ব্যাপী পালিত হচ্ছে শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০২ ও বিশ্ব শিশু দিবস। শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বছর শিশু অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে - " শিশুর সুস্থ বিকাশ, সোনালী ভবিষ্যতের আশ্বাস"।

শিশুর শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের জন্য শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমী যার উল্লেখযোগ্য অবদান সর্বজন স্বীকৃত। শিশু একাডেমীর কর্মকান্ড আজ সমগ্র দেশব্যাপী প্রসারিত ও প্রশংসিত। ইতিমধ্যে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে প্রণীত হয়েছে জাতীয় শিশুনীতি ১৯৯৪, শিশু আইন, বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন।

সম্পদ ও সুযোগের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিশু উন্নয়ন ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান সরকার পরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমে কাজ করে যাচ্ছে। শিশু উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে শিশু শ্রম নিরুৎসাহিতকরণ, ভবঘুরে শিশুদের পুনর্বাসন, দরিদ্র শিশুদের পুষ্টিমান উন্নয়ন, ঘাতক ব্যাধি হতে রক্ষা, সুস্থ ও সবল শিশুর জন্মলাভের প্রয়াসে মায়ের সুস্থতা ও নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ, শিশুদের ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত কন্যা শিশুদের অবৈতনিক শিক্ষা, শিশুর জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ। শিশু পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি, পাচারকৃত শিশুদের উদ্ধার, পুনর্বাসন ও প্রত্যাবাসন কর্মসূচী।

শিশুদের পাচার হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষার জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকার শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কিত সার্ক সনদে স্বাক্ষর করেছে। শিশু কল্যাণে আঞ্চলিক সহযোগিতা নামক অপর একটি সার্ক আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তিও সম্পন্ন করা হয়েছে।

পোলিও নির্মূলসহ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী ও শিশুদের মেধা বিকাশে আয়োডিনযুক্ত লবনের ব্যাপক ব্যবহার, এসব সাফল্য সকলের জানা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা শিশু উন্নয়ন ও শিশুর অধিকার বাস্তবায়নের কর্মসূচীকে সাফল্য মন্ডিত করতে পারব বলে আশা রাখি।

শিশু অধিকার সপ্তাহ ও বিশ্ব শিশু দিবসে আমি প্রতিটি শিশুর সুস্থ বিকাশ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ।

(মাহফুজুল ইসলাম)